বয়সে নবীন কিন্তু বইপাঠের অভিজ্ঞতায় ও
সাহিত্য-চেতনায় ঋদ্ধ শ্রী সংকেত মিত্রকে শুভেচ্ছা ও
ভালোবাসা সহ

# লেখকের কথা

বড়োদের জন্য তো লিখিই। কিন্তু কিশোরদের জন্য লিখতেও বেশ লাগে। কিশোরদের জন্য গল্প লিখেছি। ভূত, কল্পবিজ্ঞান, আনক্যানি, সামাজিক গল্প; চেষ্টা করেছি বিভিন্ন ঘরানার গল্প ছুঁয়ে দেখার। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সে-সব গল্প নিয়ে দু-বছর আগে একলব্য প্রকাশন থেকে একটা কিশোরপাঠ্য গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়েছে—'অলীকপুর হল্ট এবং অন্যান্য স্টেশন'। ছোটোদের জন্য দুটো হাস্যরসাত্মক উপন্যাসও লিখেছি। তবে সুনির্দিষ্ট কোনও চরিত্র তৈরি করে তাকে নিয়ে সিরিজ লেখার ইচ্ছেটা বছরখানেক আগে চাগাড় দিয়ে উঠেছিল। সব লেখকেরই মনে একটা বাসনা থাকে কোনও আইকনিক চরিত্র তৈরি করার, যেটা কিশোর-তরুণ সহ সব বয়স-বন্ধনীর পাঠক উপভোগ করবে এবং চরিত্রটিকে ভালোবেসে ফেলবে। ফলে সেই চরিত্রটি নিয়ে একাধিক কাহিনির সিরিজ লেখা যাবে। বাংলা সাহিত্যের দিকপাল লেখকদের প্রায় সকলেরই সৃষ্টি করা কোনও না কোনও স্মরণযোগ্য চরিত্র রয়েছে যা পাঠকমনে গভীর দাগ কেটেছে, তার মধ্যে কয়েকটি জনপ্রিয়তার নিরিখে কিংবদন্তি হয়ে উঠে বাংলা সাহিত্য-সিনেমা-সংস্কৃতির অঙ্গ বা পপ-কালচারে পরিণত হয়েছে।

লেখকের নিজস্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকেই রুবাইদা ও রীপ জুটির সৃষ্টি। রুবাইদা তেইশ বছরের তরুণ, সে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট হতে চায়। তার সঙ্গী রীপ বছর উনিশের কলেজ-ছাত্র। তাদের তদন্তমূলক অভিযানগুলি নিয়েই দুটি কাহিনি। আপাতদৃষ্টিতে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর ও ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টের মধ্যে হয়তো খুব পার্থক্য পাওয়া যাবে না, তবু সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য বোধহয় রয়েছে। ব্রেইন ওয়ার্ক দুজনেরই যথেষ্ট প্রয়োজন, কিন্তু ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টের লেগ-ওয়ার্ক কিঞ্চিৎ বেশি।

যেহেতু কিশোরপাঠ্য উপন্যাস তাই হার্ডকোর জার্নালিজমের খুঁটিনাটির গভীরে ঢুকিনি, বরং কিশোর পাঠকদের আগ্রহ ও উত্তেজনার কথা মাথায় রেখে রহস্যোদ্ধারের দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছি। এই বইতে যে দুটি কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে সেগুলি এলএফ বুকস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত সাসপেন্স বার্ষিকী ৩ এবং ৪-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

নতুন এই রুবাইদা-রীপ জুটি সৃষ্টি করে পরপর দুটি কাহিনি লেখার পর লেখক হিসেবে পাঠকদের প্রতিক্রিয়ার প্রতি আগ্রহভরে তাকিয়ে আছি। যে কোনও লেখা লেখকের ভালোবাসা থেকে উৎসারিত হলেও, পাঠকের ফিডব্যাক সবসময়ই উদ্দীপনা জোগায়, না হলে লেখক তৃপ্তি পান না। লেখকের লেখার সমালোচনাও ভীষণভাবে কাম্য মনে করি। লেখার ভালোমন্দের বিচার পাঠকমনের কষ্টিপাথরে যাচাই না হলে লেখকই বা বুঝবেন কী করে তার লেখাটি উতরেছে কি না! একজন লেখকের লেখার উন্নতি-অবনতি বা সামগ্রিকভাবে লেখকের গ্রোথ পাঠক-সমালোচনার উপর নির্ভরশীল।

তাই, আন্তরিকভাবে চাই পাঠকেরা বইটি পড়ুন এবং ভালোমন্দ জানান মুক্তকণ্ঠে। যদি এই জুটি পাঠকেরা গ্রহণ করেন তবে রুবাইদা-রীপ জুটি দীর্ঘায়ু হবে। যদি পাঠক প্রতিক্রিয়ায় কোনও ত্রুটির কথা কেউ উল্লেখ করেন, তবে এই জুটির কাহিনিগুলো ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করব।

পাঠ শুভ হোক।

রায়পুর, কলকাতা
১৫.০১.২০২৫

**পার্থ দে**

গ্রহরাজপুরে গোলযোগ ১১

রিল রহস্য ৮৩

# গ্রহরাজপুরে গোলযোগ

❖❖❖

ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম! কথাটা আমি রুবাইদার মুখে প্রথম শুনি। ওর মেসের ঘরে আড্ডা দিতে দিতেই প্রথম বলেছিল শব্দবন্ধটা। আমি অবশ্য তখনও জানি না, বস্তুটা খায় না মাথায় দেয়! সাধারণ সাংবাদিকতার থেকে এই 'তদন্তমূলক সাংবাদিকতা'-এর পার্থক্যটাই বা কী তা-ও জানতাম না।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে রুবাইদা বলেছিল, "তুই কি ভেবেছিস? এটা ফেলুদা-তোপসে খেলা? মগজাস্ত্রের মগজমারি?"

আমার প্রিয় ফেলুদাকে নিয়ে এরকম ঠাট্টা করায় খুব রাগ হয়েছিল। পালটা প্রশ্ন করেছিলাম, "আরে আমাকে না বললে বুঝব কী করে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম কী বস্তু।"

একটা বাংলা সংবাদপত্রের পাতা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ও বলেছিল, "পাঁচের পাতায় একটা খবর আছে দেখ—'বাগুইআটিতে গ্যাসের গোডাউনে চুরি'। এবার তুই বল খবরের কাগজের সাংবাদিক এই খবরটা কার কাছ থেকে জেনেছে?"

"বাগুইআটি থানা থেকে জানতে পারে। রোজ যে সমস্ত ছোটোখাটো ক্রাইমের ডায়েরি বা এফআইআর হয়, সেখান থেকে জনস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত কোনো ক্রাইমের খবর পুলিশের তরফেই কেউ সাংবাদিকদের জানাতে পারে। আবার স্থানীয় কোনও মানুষও সংবাদপত্রের দপ্তরে ফোন করে জানাতে পারে। এর বাইরে তো কোনও সম্ভাবনা দেখছি না।" "বাহ, আমার সংস্পর্শে এসে তুই দেখছি মানুষ হয়ে গেলি রে, রীপ! মাথাটা বেশ খুলেছে দেখতে পাচ্ছি।"

কথাটা শুনে খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। রুবাইদা না হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্নালিজম নিয়ে মাস্টার্স করছে, সামনের বছরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সির‍্যাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচডি করতে যাবে বলে সব ঠিকঠাক, তাই বলে আমার থেকে মাত্র চার বছরের বড়ো হওয়ার অ্যাডভান্টেজ নিয়ে সব সময় হ্যাটা করবে!

এইখানে রুবাইদা আর আমার পরিচয়টা একটু দিয়ে নিই। ওর সঙ্গে পরিচয়

আমার সেই ছোটোবেলা থেকেই। আমার মামারবাড়ি কোচবিহার; ইস্কুলে পড়ার সময় গরমের ছুটি পড়লেই আমি মায়ের সঙ্গে সেখানে চলে যেতাম। রুবাইদার মা পর্ণামাসি আমার মায়ের 'গঙ্গাজল'-মার্কা বন্ধু। দুজনে দেখা হলে কাজটাজ ভুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পে মেতে থাকতে পারে। আর সেই সুযোগেই রুবাইদা আর আমার বন্ধুত্বও ছোটোবেলা থেকে জমে উঠেছিল।

রুবাইদার ভালো একটা নাম আছে— ব্রহ্মজিৎ মিশ্র। কিন্তু পারতপক্ষে এই নামটা কিছুতেই ব্যবহার করতে চায় না। ওর জেনকিন্স স্কুলের বন্ধুবান্ধবেরা নাকি ওর নামটা বদলে দিয়ে 'ব্রহ্মদৈত্য' বলে ডাকত! সত্যি বলতে, বন্ধুদেরও দোষ দেওয়া যায় না। ছ'ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, ধবধবে ফরসা গায়ের রঙের সঙ্গে রুবাইদার মাথায় একটা লম্বা টিকি থাকলে ব্রহ্মদৈত্যই লাগত বই-কি! এ হেন রুবাইদা তার বাবার কাঠের ব্যবসায় করা অঢেল টাকার উত্তরাধিকারকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে যখন বলেছিল কলকাতায় জার্নালিজম পড়তে আসবে, তখন ওর মা ছাড়া সবাই অবাক হয়েছিল। পর্ণামাসি অবশ্য তার উড়নচণ্ডী স্বভাবের ছেলেকে চেনে বলেই অবাক হয়নি। শুধু আমার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "শুভ্রা, আজ থেকে তুই আমার ছেলের লোকাল গার্ডিয়ান, ওর ভালোমন্দ নজর রাখিস।"

মা সাগ্রহে রুবাইদাকে আমাদের বাড়িতে এনে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু রুবাইদা কিছুতেই রাজি হয়নি; পর্ণামাসি আর আমার মা-ও জোরাজুরি করেনি। তবে রুবাইদাকে যে মেসটা ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল, সেটা আমাদের দক্ষিণ কলকাতার বাড়ির কাছেই। আট মিনিটের হাঁটাপথ। ওখান থেকে ওর বিশ্ববিদ্যালয়টাও কাছেই। মেসে থাকলেও শনি-রবির দুপুরে আমাদের বাড়িতে ওর খাওয়ার নেমন্তন্নটা মায়ের স্ট্যান্ডিং অর্ডার। অন্যদিনও বাড়িতে কিছু ভালোমন্দ রান্না হলে মা টিফিন ক্যারিয়ারে করে ওর জন্য পাঠিয়ে দেয়।

রুবাইদা আমার দিকে সরু চোখে তাকিয়েছিল, "এবার বল দেখি, এই যে সাংবাদিক গ্যাস-গোডাউনে চুরির প্রতিবেদনটা লিখল, এরপরে তার কী কাজ থাকতে পারে?"

খানিক মাথা চুলকে বলেছিলাম, "এরপর তো যা কাজ করবে, পুলিশই করবে।"

"তার মানে, তোর বক্তব্য অনুযায়ী, ওই সাংবাদিকের আর কোনও কাজ নেই। সে এবার ওই খবরটা ভুলে অন্য নতুন খবরে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাই তো?"

"হ্যাঁ, তা ছাড়া কী? এবার পুলিশ এসে চোর ধরবে। আর চোর ধরা পড়লে পুলিশেরও কাজ শেষ।"

"অথচ এই সাংবাদিকই যদি তদন্তমূলক সাংবাদিকতার পথে যেত তা হলে এই ছোটো কেঁচোটাই হয়তো সাপ হয়ে বেরিয়ে পড়ত। আসলে এইসব মামুলি খবরের ভিতরে গেলে কাগজের সার্কুলেশন যে বাড়বে না, সে-কথা খবরের কাগজের এডিটরসাহেব জানেন, তাই তিনি সাংবাদিকটিকে এই স্টোরি নিয়ে এগোতে উৎসাহ দেননি, আর ভবিষ্যতেও দেবেন না। তা ছাড়া এইসব ছোটোখাটো খবর কুৎসাপ্রেমী হুজুগে পাঠকেরা দু'দিনে ভুলেও যাবে।"

"কিন্তু এই খবরটায় যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ত, সে-কথা তুমি কী করে জানলে?"

"তুই কি ভাবিস আমি খোঁজখবর না করেই বলছি?" রুবাইদার মুখে একটা বিচ্ছু-টাইপের হাসি ফুটে উঠেছিল, "কাগজটার তারিখটা দেখ, এক মাস আগের। আমি জার্নালিজম মাস্টার্সের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র হলে কী হবে, এখন থেকেই কিন্তু ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমে মকশো করে হাত পাকাচ্ছি।"

"কিন্তু এই চুরির কেসটা সাদামাটা নয় বলছ কী করে?"

"তা হলে শোন, এই গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর মালিকটির নাম সুবীর মিত্র, ওঁরই ভাড়া নেওয়া গ্যাস-গোডাউন। চুরিটা নেহাতই মামুলি; আটটি গ্যাসের সিলিন্ডার চুরি হয়েছে। ওটা আসলে সাবোতাজ, সুবীরবাবুর কোনও কর্মচারী অর্থাৎ নিজের লোককে দিয়েই করানো হয়েছে কাজটা। আসল ষড়যন্ত্রের বীজ অন্য জায়গায়। উত্তর কলকাতার ওই অঞ্চলের কাছেই একই গ্যাস-কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটর রয়েছেন আরেকজন প্রভাবশালী মারওয়াড়ি ভদ্রলোক, মনীশ আগরওয়াল। ইনি চাইছেন সুবীরবাবুর ব্যবসা হাতিয়ে নিতে, সেটা করতে গেলে ওঁর কনজিউমারদের নিজের ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে টেনে আনতে হবে। সেটাই করছেন শেঠজি। গ্যাস-গোডাউনে চুরির নাটক সাজিয়ে বদনাম করতে চাইছেন; সুবীরবাবুর কনজিউমারদের আস্থা টলিয়ে দিতে চাইছেন। আমি ইনফরমেশন নিয়ে দেখেছি, এই গ্যাস-গোডাউন থেকে প্রায় একশো মিটার দূরে একটা নার্সিংহোম আছে। আগরওয়াল মাসখানেক আগে সেই নার্সিংহোমের মালিক সুনীল বিহানিকে দিয়ে হাইকোর্টে এই মর্মে পিটিশন করিয়েছে যে নার্সিংহোমের কাছে গ্যাস-গোডাউন থাকা বিপজ্জনক, রোগীদের জীবনের স্বার্থে আদালত ওই গোডাউন অবিলম্বে বন্ধ করে দিক, নয়তো অন্যত্র সরিয়ে দিক। অথচ গত ছয়-সাত বছর ধরে ওই নার্সিংহোম আর গ্যাসের গোডাউন একই জায়গায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ছিল, কোনও সমস্যা হয়নি।"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম রুবাইদার দিকে, "বাপরে, তা হলে একেই

বলে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম!”

“ইয়েস ব্রো, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন!”

সেদিন থেকে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নিয়ে আমার একটা আইডিয়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। রুবাইদা-কে দেখতাম রেগুলার অনলাইন শপিংয়ের মাধ্যমে একটার পর একটা জিনিস কিনেই চলেছে- বলপেনে লাগানো স্পাই ক্যাম, প্যানোরামিক ভিউয়ের হিডেন ক্যামেরা, মিরর ভিশন স্পাই চশমা (যা দিয়ে মাথার পিছনের সবকিছু দেখা যাবে), বলপেন ভয়েস রেকর্ডার আরও কতরকমের সব স্মার্ট গ্যাজেট; এগুলোই নাকি ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি!

এ সব দেখে আমারও আস্তে আস্তে একটা আগ্রহ জন্মাচ্ছিল। একদিন বলে বসলাম, “রুবাইদা, ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম ব্যাপারটা তো বুঝলাম, কিন্তু এটা কি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি করা যায়?”

“কেন যাবে না! মনে কর, আমরা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এজেন্সি খুললাম। এই ধর, তুই আর আমি। এবার বিভিন্ন ইন্টারেস্টিং ঘটনার অন্তর্তদন্ত করে স্টোরি তৈরি করে সেগুলো সংবাদপত্র কিংবা ডিজিটাল নিউজ পোর্টালকে বেচে দিলাম। এভাবেই তো নিউজ এজেন্সিগুলো কাজ করে। মনে রাখিস, সাধারণ সংবাদপত্রগুলো যে সব খবর কভার করে না কিংবা ইগনোর করে, একজন ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টের কাজ সেগুলোকেই খুঁড়ে সত্য উদ্ঘাটন করা। সেটা সামাজিক অন্যায়ের ঘটনা হতে পারে, সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রের কোনও দুর্নীতি হতে পারে, এমনকি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও হতে পারে। এই ধরনের সাংবাদিকেরা বিভিন্ন ডেটাবেস, লিগ্যাল রেকর্ড ঘেঁটে কিংবা তথ্যের অধিকার আইন প্রয়োগ করে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে কাজ করেন। ভারতের সবচেয়ে বড়ো তদন্তমূলক সাংবাদিকতার সংস্থা হল সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম। এটা অবশ্য নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন। আমরাও ছোটোখাটো মাপের একটা কনসাল্টেন্সি তো বানাতেই পারি।”

“বাহ্, দারুণ আইডিয়া তো, শুনেই কেমন রোমাঞ্চ হচ্ছে। নাম কী দেবে?”

“এই ধর, জয় অ্যান্ড ভীরু ইনভেস্টিগেটিং সার্ভিসেস দেওয়া যেতে পারে।”

“যাহ্, তুমি ইয়ার্কি করছ, এ তো শোলে সিনেমা হয়ে গেল!”

“আমার উচ্চতা আর তোর ভাঁড়ামোর সঙ্গে মিলিয়ে নাম দিলুম তো, ভালো লাগেনি!”

"তুমি আমাকে ভাঁড় বললে? এ সব নাম চলবে না।"

"বেশ, তা হলে 'র' রাখলে কেমন হয়?"

"যাহ্, তা কেমন করে হবে, ওটা তো আমাদের দেশের গুপ্তচর সংস্থার নাম!"

"আমি কিন্তু আমাদের দুজনের নাম— রুবাই আর রীপের সঙ্গে মিলিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম।" ফাজিল হেসে রুবাইদা বলল।

"ধুর, অন্য একটা ভালো নাম দাও না।"

"বেশ দিলাম। ABIS- 'অন্তরীপ ব্রহ্মজিৎ ইনভেস্টিগেটিং সার্ভিসেস'! নামটা বিখ্যাত আমেরিকান পুলিশ ইনভেস্টিগেশন টিভি সিরিজ 'NCIS' এর সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে রাখলাম। চলবে না?"

"দৌড়বে!" বলে আমি হাত বাড়িয়ে রুবাইদার সঙ্গে একটা হাই-ফাইভ করলাম।

## দুই

রুবাইদা-দের মেসে একটা ঘরে দুজন করে থাকে। ওর রুমমেটের নাম পালদেন ভুটিয়া; কালিম্পংয়ের ছেলে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতকস্তরের ছাত্র। ঘরে থাকলে সারাদিন একটা টুলবক্স খুলে খুটুর খুটুর করে। রুবাইদার অনলাইনে কেনা গ্যাজেটসগুলোয় গণ্ডগোল হলে আমরা পালদেনের দ্বারস্থ হই। মিনিট বিশেকের মধ্যেই সে দিব্য মেরামত করে দেয়। একপ্লেট মোমো পেলে পালদেন মানুষ খুন ছাড়া যাবতীয় কাজ করে দিতে পারে। সেজন্য আমরা ওকে 'মোমো' নামে ডাকি। সেদিন রোববার ছিল। ইউনিভার্সিটির মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে চোট লাগায় রুবাইদা আমাদের বাড়িতে দুপুরের খাওয়ার নেমন্তন্নে আসতে পারেনি। কিন্তু মায়ের ভালোবাসার অত্যাচার টিফিন ক্যারিয়ারে করে আমার হাত মারফত ওর মেস পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ওর জন্য বাসন্তী পোলাও আর চিকেন কষা করে মা পাঠিয়ে দিয়েছিল। রুবাইদা বলল, "শুভ্রা মাসির কী মাথা খারাপ! এ তো আমার দু'দিনের খোরাকি! আমার জন্য দু'পিস চিকেন রেখে বাকিটা তুই সাঁটিয়ে দে রে নাড়ুগোপাল!"

আমি একটু ভোজনরসিক বলে অনেকেই নাড়ুগোপাল বলে ডাকে। এই বিচ্ছিরি নামটা আমার পছন্দ নয় বলে প্রতিবাদ করে উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মায়ের হাতের চিকেন কষার স্বাদের কথা মনে পড়তেই পাভলভের এক্সপেরিমেন্টের কুকুরগুলোর মতো আমার নোলার ডগায় জল চলে এল। বললাম, "নেহাত তুমি

অনুরোধ করলে তাই খাচ্ছি!”

রুবাইদা হাসতে হাসতে দেখল বাড়িতে একপেট খেয়ে আসার পরেও ছ’পিস চিকেন আর একপ্লেট পোলাও খেয়ে নিলাম আমি।

এত খাওয়াদাওয়ার পরে মেসের বিছানায় একটু টানটান না হলে এই নশ্বর শরীরকে বৃথা কষ্ট দেওয়া হয়। ভাবামাত্র রুবাইদার বিছানায় শুয়ে নাক ডাকতে লাগলাম। পেট ভরা থাকলে আমার নিমেষে ঘুম পায়; আবার ঘুম থেকে উঠলেই খিদে পেয়ে যায়। কিন্তু খেলেই আবার ঘুম পায়। ব্যাপারটা ভিশাস সাইকেলে চলতেই থাকে। ফলে ছুটির দিনে আমার অন্য কাজকর্ম করাই হয় না। এই নিয়ে আমার বাবার আক্ষেপ, “রীপটা খাওয়া-ঘুমের দুষ্টচক্রে আটকে পড়েছে, এখান থেকে বেরোতে না পারলে ওর পড়াশোনা চাকরিবাকরি কিস্যু হবে না।”

আমার সাধের ঘুমটা অবিশ্যি বেশিক্ষণ টিঁকল না। পিঠে একটা গুঁতো মেরে রুবাইদা বলল, “অ্যাই রীপ, ওঠ ওঠ! তুই নাকি ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট হবি, এরকম পড়ে পড়ে ঘুমোলে একমাত্র কুম্ভকর্ণ নামটা কপালে জুটবে, আর কিচ্ছু হবে না।” ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেই খবরের কাগজটা এগিয়ে দিয়ে রুবাইদা বলল, “পাঁচের পাতার খবরটা দেখ। খুব ইন্টারেস্টিং।”

ঘুমচোখে কাগজের পাতা উলটে খবরটায় চোখ রাখতেই আমার চটকা ভেঙে গেল। শিরদাঁড়া টান করে বসলাম। হপ্তা তিনেক আগের কাগজটার পাঁচের পাতার নিচের দিকে চার-পাঁচ লাইনের খবর। অন্য কেউ হলে চোখ এড়িয়ে যেত, রুবাইদা বলেই ঠিক চোখে পড়েছে। আমি গড়গড় করে খবরটা পড়তে শুরু করলাম।

‘গ্রহরাজপুরে ভ্যাম্পায়ার আতঙ্ক।’

নিজস্ব প্রতিবেদক: মাসখানেক ধরে উত্তর চব্বিশ পরগণার গ্রহরাজপুর গ্রামের মানুষ ভ্যাম্পায়ারের আতঙ্কে ভুগছে। শোনা যাচ্ছে, সন্ধ্যার পর নাকি নির্জন স্থানে গ্রামের মানুষের ওপর ভ্যাম্পায়ারের আক্রমণ হচ্ছে। তারা এসে নাকি সাধারণ গ্রামবাসীদের রক্ত চুষে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এলাকায় ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি হওয়ায় গ্রামের লোকজন সন্ধের পর বাড়ির বাইরে বেরোতে চাইছে না। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে, তবে এখনও পর্যন্ত ভ্যাম্পায়ার রহস্যের কোনও সমাধান হয়নি। স্থানীয় পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের তরফে গ্রামের মানুষদের গুজবে কান না দিতে বলা হয়েছে।

“তোর কী মনে হয়?” আমার পড়া শেষ হতেই রুবাইদা বলল।

“গুজব বলেই তো মনে হচ্ছে, ইয়ে মানে... এসব আজকাল কেউ বিশ্বাস